প্রচলিত নামাজ নিখুঁত মোশরেকের দলিল

মো: জামিলূল বাসার

ইয়া আইয়ু হাল্লাজীনা-----তাক্কুলুন। [নিছা-৪৩] অর্থ: হে ভক্তগণ! তোমরা মাতালের মত নামাজে যেও না। যতক্ষণ না বুঝতে পার যা তোমরা নামাজে বলছো।

উল্লেখিত আয়াতটির সরলার্থ গ্রহণ না করে বরং তার শানে-নজুল অর্থাৎ জন্ম ইতিহাস রচনা করে শরিয়ত বুঝাতে চেষ্টা করেছে যে, একদা হযরত আলী [রা] মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় নামাজ পড়তে গিয়ে অমুক সুরা আবৃতি করতে গিয়ে তমুক সুরা আবৃতি করেছিলেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়; অতঃপর মদ হারাম হওয়ার আয়াত নাজিল হয়। এখানেই আয়াতটি জব্দ করে রেখেছেন। আল্লাহর নবী ছোট বেলা থেকেই সুন্দর, মার্জিত, সু-শৃংখল, ভদ্র, নম্র, এবং বলিষ্ঠ আদর্শবান ছিলেন। মদের আয়াত নাজিল হোক বা না হোক, তিনি কখনও মদ খেয়েছেন, জুয়া খেলেছেন, বালিকাদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করেছেন, মিথ্যা বলেছেন, আমানতের খেয়ানত করেছেন; এমন কোন ইতিহাস সম্ভবত অমুসলিমদেরও জানা নেই। তাঁরই জীবন মরনের বন্ধু, সহচর, চরম বিশ্বস্ত, ভক্ত হযরত আলী এমন কি মুসলিম হওয়ার পরেও মদ খেয়ে মাতাল হয়ে নামাজ পড়তেছিলেন! অতঃপর নামাজে উল্টো-সিধে আয়াত আবৃতি করছিলেন! প্রকৃত মোসলেমদের এমন বিশ্বাস করতে কষ্ট হওয়ার কথা। কারণ:

১. তিনি মাতাল হয়ে উল্টোসিধে আয়াত আবৃতি করছিলেন, অথচ ইমাম হযরত আবুবকর [রা] অথবা হযরত মুহম্মদ [সা] স্বয়ং হযরত আলীকে [রা] ধমক দিয়েছেন কি সতর্ক করেছেন বা মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছেন; এমন কোন হাদিস ইমামগণ রচনা করেন নি।
২. শরিয়তের ধারা মতে, জামাতের নামাজে মুসল্লীদের তেলাওয়াত নিষিদ্ধ, তাই তারা কিছুই বলেন না। অতএব মুসল্লী হয়ে হযরত আলীর [রা] তেলাওয়াত করার কথা নয়। পক্ষান্তরে তিনি তেলাওয়াতের জন্য অভিযুক্ত হন নি, অভিযুক্ত হয়েছেন 'ভূল! আবৃতির জন্য!'
৩. রাসূলের [সা] জীবিতাবস্থায় সুরার কোন নামকরণ হয়নি এবং নির্দিষ্ট করে ১১৪টি ভাগ করাও হয়নি।
অতএব "অমুক সুরা বলতে গিয়ে তমুক সুরা তেলাওয়াত করেছেন" উক্তিটি সন্দেহজনক বটে!
৪. শরিয়তের মতে নামাজে সুরা ফাতেহার পরে যে কোন সুরার যে কোন আয়াত আবৃতি করার বিধান আছে। অতএব হযরত আলী [রা] যদি এমন কিছু করেই থাকেন তাতে শরিয়তের আপত্তি থাকার কোন যুক্তিই নেই।
৫. সর্বোপরি হযরত আলী [রা] মদ খাক বা নাই খাক, আর যে কারণেই আয়াতটি নাজিল হোক না কেন, তার মূল ও মৌলিক নির্দেশ হলো: নামাজে যা বলা হবে, নামাজে যাওয়ার পূর্বেই তা জানতে হবে, বুঝতে হবে যে, সে নামাজে কি বলছে বা বলবে। অর্থাৎ শপথনামাটি পড়ে, জেনে, বুঝে, হৃদয়ঙ্গম করে, স্বীকার করত এবং তা বলবৎ রাখার অঙ্গিকারে, স্ব-জ্ঞানে, স্ব-ইচ্ছায় এবং সুস্থ মস্তিষ্কে সহি করলাম। নেশাখোর, মাতাল কি বলে আর কি করে তা নিজেই জানে না; নেশা কেটে গেলে তার কিছুই মনেও থাকে না বলেই নেশাখোরের উদাহরণটি দেয়া হয়েছে মাত্র। নামাজে আল্লাহর কাছে কি চাইলাম, কি শপথ বা অঙ্গিকার করলাম! তার কিছুই জানি না, বুঝি না; অতএব, তা কায়েম করার কোন প্রশ্নই ওঠে না! তা নেশাখোরের মতই তো বটে!! আর এখানেই শেষ নয়:

'নামাজ' পারর্শী শব্দ। ইংরেজিতে প্রেয়ার, আরবিতে 'ছালাত' এবং বাংলায় প্রার্থনা, উপাসনা বা পূজা। ইসলাম অথবা যে কোন ধর্মের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানাদির মধ্যে অন্যতম ও শ্রেষ্ঠতম বিষয় 'ছালাত'। ইংরেজগণ বলেন,'ডু প্রেয়ার', হিন্দুগণ বলেন, 'পুজা করি', আর আমরা বলি 'নামাজ পড়ি'; যদিও 'একরাচ্ছালাত' কোরানের কোথাও নেই; আছে 'আকিমুচ্ছালাত', যার অর্থ প্রার্থনা করা,প্রতিষ্ঠিত রাখা বা বলবৎ রাখা। ধর্মীয় বিষয় প্রধানত আরবি ভাষার ব্যবহার [বোধগম্য হলে], অগত্যা আপন ভাষাই জরুরী। কিন্তু এ দু'টির একটিও ব্যবহার না করে সুদুর পারশী ভাষা 'নামাজ' ব্যবহার করে আসছি। ফলে হাদিসের মতে আরবি হরফ প্রতি দশগুণ ছোয়াবের বয়ানে 'ছালাত' আরবিতে অক্ষর ৪টি × ১০ = ৪০ ছোয়াব, দৈনিক ৫ বার উচ্চারণ করলে ৫ × ৪০= ২ শত ছোয়াব; ৩০ দিনে × ২= ৬০০০ ১২ মাসে × =৭২ হাজার; ৫০ বৎসর অনুন আয়ু = ৩৬ লক্ষ আরো অনুন ১৫টি শব্দ থাকলে [যেমন: খোদা, বেহেস্ত, দোযখ, ফেরেস্তা, মুনাজাত, জবাব, দোয়া, মোসলমান, রোজা ইত্যাদি=৫ কোটি, ৪০ লক্ষ ছোয়াব লোকসান দিয়ে মৃত্যুবরণ করছি; মাত্র সামান্য গাফলতির কারণে। প্রকাশ থাকে যে, বেহেস্তে যেতে কত ছোয়াব দরকার তা হাদিস, ফেকহা, এজমা, কেয়াছ কেউই বলতে পারে না! আলেমগণের সম্মিলিত ফতোয়াও শোনা যায় না। আরব দেশের রিয়ালগুলি এক একটি ছোয়াবের নগদ প্রতিকৃতি বলেই এতবড় লোকসানটা কথিত ইসলামিক দলগুলির নেতাদের চোখে পড়ে না।

শহীদ জিয়াউর রহমানের আমলে জামাতের জনৈক রোকন [নাম মনে নেই] বিটিভি'র ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালক, তার আব্বার নির্দেশে পারশী শব্দ 'খোদার' পরিবর্তে 'আল্লাহ' শব্দটি ব্যবহার করার জন্য মোসলেম জাতির নিকট আকুল আহ্বান জানান। অর্থাৎ 'খোদা হাফেজ' বাক্যটি উচ্চারণ না করে বরং 'আল্লাহ হাফেজ' বাক্যটি উচ্চারণ করতে হবে। সেই থেকে

সুদূর বিদেশেও কিছু মোসলেম ভাইগণ এ বাক্যটি ব্যবহার করে আসছেন। গুণতে, শুনতে এবং ভাবতে আনন্দই লাগে যে, অন্তত কিছুটা হলেও ঘাটতি পূরণ হয়েছে। ভদ্র লোকটির আব্বা যদি জানতেন যে, নামাজ, রোজা, মুনাজাত, ফেরেস্তা, বেহেস্ত, দোযখ ইত্যাদি এ ধরণের বহু পারশী, হিন্দি, উর্দু, হিব্রু শব্দ ধর্মকর্মে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং আমাদের জীবনে কোটি কোটি ছোয়াব হাত ছাড়া হচ্ছে তবে অবশ্যই তার রোকন ছেলেকে এর বিরুদ্ধেও পূর্ববৎ নির্দেশ দিতেন।

শব্দগুলির অর্থ কারো জানা নেই, পক্ষান্তরে তার তফসীর, ব্যাখ্যা সকলেই জানেন। শব্দের অর্থ না জানলে তার ব্যাখ্যা করা যায় না; এ ধারণা বা বিশ্বাস এখনও অনেকের জন্মায় নি। শব্দের অর্থ জানা না থাকলে তার তফসীর, ব্যাখ্যা কাল্পনিক ও অনুমান হেতু এমনকি হিতে বিপরীত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং এর পরিণতি বেয়াদবী, আহাম্মুকী, কুফুরী, জাহান্নামী অতঃপর ধ্বংস অনিবার্য।

যে কোন বিদেশী ভাষা বা শব্দ সর্বজনীনভাবে জানা-বোঝা থাকলে হাজার হাজার বিদেশী শব্দ আসুক বা যাক, তাতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু জানা নেই, বোঝা নেই বলেই তো বলছি 'নামাজ পড়ি'। মানুষ পড়ে শেখার জন্য, শেখা হয়ে গেলে পড়ার আর প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় করার। তাই এমনকি গন্ড মূর্খগণও বলেন না যে, প্রার্থনা পড়ি, অজু-গোসল পড়ি, পায়খানা-প্রস্রাব পড়ি, রোজা পড়ি, মোনাজাত পড়ি ইত্যাদি। অতএব ব্যাকরণের ধারায় ছোট হোক বড় হোক, ভুল যে বলছি তা অনস্বীকার্য। আর এখানেই শেষ নয়; প্রার্থনার সাথে দৈনীন্দন কাজ-কর্মের মিল, সমর্থন, সহযোগিতা না থাকলে প্রার্থনা গৃহীত হওয়ার বিন্দুমাত্র নিশ্চয়তা থাকে না।

বিচারকের কাছে কিছু প্রার্থনা করলে বা ক্ষমা চাইলে বিচারক ক্ষমা করতে পারে বটে, কিন্তু সে চাওয়া পাওয়ার বা ক্ষমা চাওয়ার বিষয়বস্তুগুলি কি কি তা ঠিক ঠিক বর্ণনা করতে হবে এবং বিচারক কর্তৃক অর্পিত শর্তগুলি কি কি তাও বিশদভাবে বুঝতে হবে এবং জানতে হবে। তবেই না উহা কর্ম জীবনে রক্ষা করে চলা সম্ভব হবে; অতঃপর প্রার্থনা পূরণ হওয়ার আশা করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে, 'নামাজে' কি চাইলাম! কি ওয়াদা করলাম! কি বললাম! হৃদয়ের চাওয়াগুলি ঠিক ঠিক বর্ণনা করতে পারলাম কি না! যে আয়াতগুলি তেলাওয়াত করলাম তাতে আমার অভাব অভিযোগগুলি বর্ণিত আছে কি না! অতঃপর কি কি শর্তের অধীনে আমাকে চলতে হবে, তার বিন্দু বিসর্গ পর্যন্ত জানা নেই বোঝা নেই। অতএব তা প্রতিষ্ঠিত রাখা বা বলবৎ রাখা কারো পক্ষে সম্ভব হয় না। সে বার বার প্রার্থনা করবে, বার বার ক্ষমা চাইবে, বারবার ওয়াদা করবে এবং বারবার তা অস্বীকার করবে, লঙ্ঘন করবে, এটা নিতান্ত স্বাভাবিক, কারণ তার কিছুই জানা বোঝা নেই অর্থাৎ তার বক্তব্য সম্বন্ধে তার নিজেরই কোন ধারণাই নেই। অর্থাৎ নেশা খোর, মাতালের মতই কাজটি সমাধা করে আসলাম। তাই বলেই নামাজ শেষে, হজ্জ শেষে পূর্ববৎ এবং ততোধিক অন্যায়, অবিচার পাপ করেই থাকি। মুসলিম বিশ্বের অধঃপতনের এটিই প্রধান কারণ! হাদিসের আলোকে বদ্ধমূল ধারণা যে, অতীতের সকল পাপ মুছে গেছে, সুতরাং পুন পুন করলেই বা ক্ষতি কি! পরের বছর হজ্জ, কোরবানী বা পাথর চুষে পুনঃ মুছে ফেলা যাবে! অতএব সে যতই নামাজ করে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অধিকতর পাপ বৃদ্ধি করে, ততই সে মোনাফেকের দলভূক্ত হয়। এদের সম্বন্ধে কোরানের হুশিয়ারী লক্ষ্যণীয়:

১. ইন্নাল্লাজীনা আমানু----মুনাফিকুন। [নিছা-১৩৭] অর্থ: যারা ঈমান আনে অতঃপর কুফুরী করে, আবার ঈমান আনে আবার কুফুরী করে; অতঃপর তাদের কুফুরী এরূপ বাড়তেই থাকে। আল্লাহ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না, পথও দেখাবেন না।

২. অল্লাজীনা ইয়ানকুদুনা---খাছিরুন। [বাকারা-২৭] অর্থ: যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করার পরে উহা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ দিয়েছেন তা ভঙ্গ করে এবং দুনিয়ার বুকে অশান্তি, গোলযোগ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্থ [দোজোখী]।

নামাজে যা বলা হয় তা আপন ভাষায় হৃদয় দিয়ে বুঝতে না পারলে, হৃদয় নিংড়ানো প্রেরণা, অনুভূতি, আগ্রহ, একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার উদয় হয় না। ফলে দাঁড়াবার ভাব, ভঙ্গি, আওয়াজ, সুর, নম্রতা ও বিগলিত ভাবধারা সমাজ জীবণে আদর্শ,ভদ্রতা ধারণ করা সম্ভব হয় না। চাওয়া-পাওয়া ও বাস্তব কর্ম জীবনের লাভ লোকসানের যোগ বিয়োগ বা মূল্যায়ন ও সংশোধন কিছুই সম্ভব হয় না। যার পরিণতি দাঁড়ায় নিরূপ :

আরাইতাল্লাজী--মাউন। [মাউন-১-৭] অর্থ: তুমি কি তাকে দেখেছো, যে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে? এবং অভাবীদের সাহায্য সহযোগিতা করে না! সুতরাং ধ্বংস হবে সেই সমস্ত নামাজীগণ, যারা নিজেদের নামাজ সম্পর্কে বেখেয়াল ও অজ্ঞ। উহারা লোক দেখানো নামাজ করে; তারা পাড়া প্রতিবেশীদের সাহায্য সহযোগিতা থেকে বিরত থাকে। এ আয়াতের বিষয়বস্তু জানা, বোঝা না থাকলে শর্তগুলি কিভাবে সে রক্ষা করে [আকিম] চলবে!

জায়নামাজে দাঁড়িয়েই আমাদের শপথ: ইন্নি অজহাতু অজহিহা লীল্লাজী ফাতারাছ ছামাওয়াতে অল আর্দ হানিফা অমা আনা মিনাল মোশরেকীন। [আনআম-৭৯] অর্থ: আমি নিশ্চয়ই একনিষ্ঠভাবে তার দিকে মুখ ফিরালাম, যিনি দৃশ্য অদৃশ্যের সৃষ্টিকর্তা এবং আমি:দো'মূখো বা মুশরিকদের দল ভূক্ত নই।

এ শপথ নামা বুঝতে না পারলে মানা যায় না, চেষ্টা করাও সম্ভব নয়। বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর ঠিকানা জানা বোঝা

না থাকলে কিভাবে আল্লাহর দিকে মুখ ফিরাবো, আর মুখ ফিরিয়েছি তা কিভাবে প্রমাণ পাবো! প্রকৃতপক্ষে, নামাজে দাঁড়ালে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, চাকুরী, ধনদৌলত, নারী-গাড়ি ইত্যাদির দিকে মুখ ফিরে থাকে। আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়েছি শতবার বললেও মুখ সেদিকে ফিরে না। আল্লাহ কি! কোথায় তাইতো জানি না; অতএব সে দিকে মুখ ফিরাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আল্লাহ কোথায়! তার ঠিকানা কি! পরিচয় কি! কিভাবে মুখ ফিরানো যায়! উহার বিস্তারিত বিবরণ কোরানে বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। তা পড়ে, জেনে, বুঝে, গবেষণা করে, পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করে, তার নিশানা আবিষ্কার করে তার দিকে স্বচ্ছ আয়নার মত একনিষ্ট হওয়া যায়; আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে তার দিকে একনিষ্ট হয়ে সমস্ত নামাজের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য স্বার্থক করে আদর্শ, অভাবহীন ও পরিশুদ্ধ পবিত্র [জাকাত] হওয়া যায়।

সুরা ফাতেহার অপর নাম ছালাত। ছালাতের জন্যই সুরাটি সাজিয়ে-গুছিয়ে অবতীর্ণ করা হয়েছে। ছালাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য : ক) স্তুতিবাদ খ) আনুগত্য ও গ) দরখাস্ত। ইহাতে মানুষের সারা জীবনের চাওয়া পাওয়ার আবেদন নিবেদন নিহিত আছে। নামাজে উক্ত ফাতেহার পরে যে কোন সুরার অন্যুন যেকোন ৩টি আয়াত তেলাওয়াৎ করা যুক্তিহীন ও নিষ্প্রয়োজন, বরং এর পরিণতি ভয়াবহ। অবশ্য জরুরী এবং স্বতন্ত্র কিছু চাওয়া পাওয়ার থাকলে অথবা নিজ আশা আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করতে চাইলে, এটা যে সমস্ত আয়াতে বর্ণিত আছে ঠিক সেই সমস্ত আয়াত অথবা মন যা চায় তা জেনে বুঝে [অর্থাৎ সঙ্গত অসঙ্গত] ঠিক তাই-ই আপন ভাষায় নিবেদন করা উচিৎ। আপন ভাষায় হৃদয় নিংড়িয়ে হৃদয়ের সকল প্রেরণা ঢেলে দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ ঘাম ঝরা কাকুতি মিনতি করা যায়, একনিষ্ঠ হওয়া যায়। আত্মসমর্পণের এইতো সহজ পথ। অজানা, আচেনা ভাষায় যা মোটেই সম্ভব নয়। আল্লাহ আরবি ভাষা চায় না বরং আরবি ভাষায় লিখিত সংবিধানের মর্মার্থ আপন ভাষায় বুঝুক এবং ঠিক ঠিক পালন করুক, আল্লাহ এটাই চায়। পক্ষান্তরে আমরা না জেনে না বুঝে যে সমস্ত আয়াত তেলাওয়াৎ করি, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কত ভয়াল, বেয়াদবি তথা কুফুরী তা নিম্নে লক্ষ্যণীয় :

নামাজে বলছি,"ক্বুল! হু আল্লাহু আহাদ"। বল! আল্লাহ একক। বিশ্বের সকল ইমামগণ বলছেন: বল! আল্লাহ এক। অতঃপর বিশ্বের সকল মুসুল্লীও ঐ একই সুরে বলছেন: বল! আল্লাহ একক! আমি স্বীকার করছি যে, 'আল্লাহ একক' এমন স্বীকারোক্তিমূলক ঘোষণা বিশ্বের একজন ইমাম, মুসল্লীও করেন না! এজলাসে বিচারক বলছেন, "স্বীকার কর! আমি বিচারক"। আসামী সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, 'স্বীকার কর আমি বিচারক'! প্রশ্ন বা আদেশের উত্তর পাল্টা প্রশ্ন বা আদেশ, চরম মূর্খতা, ধৃষ্টতা তথা চরম বেয়াদবি এমনকি কুফুরি বটে!

বিশ্বের সকল আলেম-আল্লামাদের অভিমত যে, 'ক্বুল' শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু 'হু আল্লাহু আহাদ' বললে আয়াতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে বলা হয়, রদ-বদল করা হয় যা কুফুরী তুল্য অপরাধ! প্রকৃতপক্ষে নামাজের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে শরিয়তের কোনই ধারণা নেই বলেই তারা সাধারণ জ্ঞান শুন্য এবং স্ব বিরোধী মন্তব্যটি করে থাকেন। 'মুনাজাত' অর্থও প্রার্থনা বা ছালাত বা নামাজের অংশ যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে কিন্তু প্রচলিত মুনাজাতে বলা হয়:

১. 'অমিন হুম মাইয়াক্বুলু! রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাছানাতাও অফিল আখিরাতে হাছানাতাও অকিনা আজাবান্নার' [বাকারা-২০১] উল্লেখিত আয়াতের শুরুতে শব্দ নয় বরং পূর্ণ একটি আয়াত আছে: 'অমিন হুম মাইয়াক্বুলু' অর্থ: এবং তাদের মধ্যে যারা বলে' এ আয়াতটুকু বাদ দিয়েই রাব্বানা থেকে শুরু করেন কেন!
২. অল্লাজীনা ইয়াক্বুলুনা! রাব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগফিরলানা যুনুবানা অকিনা আজাবান্নার। [এমরান-১৬] আয়াতটির শুরুতে লেখা আছে, 'অল্লাজিনা ইয়াক্বুলুনা' অর্থ: 'এবং যারা বলে' এ আয়াতটুকু তারা বাদ দিয়ে পড়েন কেন!
৩. ক্বুল! ইন্নাচ্ছালাতি অ নুছুক্বী মাহইয়ায়া অ মামাতিল্লাতি রাব্বিল আলামিন। [আনআম-১৬২] আয়াতটির শুরুতে আছে 'ক্বুল' অর্থ: বল! তা তারা বলেন না কেন!
৪. ক্বালা! রাব্বানা যালামনা আনফুছানা অ ইল্লাম তাগফিরলানা অ তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাছেরিন। [আরাফ-২৩] শুরুতে 'ক্বালা' শব্দটির অর্থ: 'যারা বলে' কিন্তু উহা বাদ দিয়ে নামাজে [মুনাজাতে] তেলায়াত করেন কেন!
৫. অ ল্লাজিনা ইয়াক্বুলুনা! রাব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা অ যুররিইয়াতিনা কুররাতা আইউনি অজআলনা লিল মুত্তাক্বিনা ইমামান। [ফুরকান-৭৪] কিন্তু 'অল্লাজিনা ইয়াক্বুলুনা' 'এবং যারা বলে' বাক্যটি কেন বাদ দিয়ে বলে থাকেন!

নামাজে গুরুতর শেরেকী বক্তব্য পুনঃ লক্ষ্যণীয়:

১. ইন্না আতাইনাকাল কাওছার---আবতার। [কাওছার-১-৩] অর্থ: নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পরশমনি [কাওছার] দান করেছি। অতএব তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ কর ও কুরবানী কর [গবেষক ও সেবাবাদী হও]।
২. ইন্না- আরছালনা-কা বিল হাক্কি---জ্বাহীম। [বাকারা-১১৯] অর্থ: নিশ্চয়ই আমিই তোমাকে সনাতন ধর্মসহ প্রেরণ করেছি----। জাহান্নামীদের বিষয় তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবো না।
৩. অ লান তারদ্বা---অ লা-নাছির। [বাকারা-১২০] অর্থ:--- বল! আল্লাহর পথ নির্দেশই প্রকৃত সনাতন পথ। জ্ঞান প্রাপ্তির পরেও তুমি যদি তাদের খেয়াল খুশীর অনসুরণ করো তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন সাহায্যকারী বা অভিভাবক পাবে না।

৪. ইয়া বনি-ইস্রা-ঈলাজকুরূ----আলামীন। [বাকারা-১২২] অর্থ: হে বনি ইস্রাইলগণ! আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো! -------এবং বিশ্বে সকলের উপরে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ত্বতা দিয়েছি।

৫. অ লাইন আতাইতাল্লাজীনা------জা-লিমীন। [বাকারা-১৪৫] অর্থ:---- তোমার [মোহাম্মদ] নিকট জ্ঞান আসার পর তুমি যদি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ কর তবে অবশ্যই তুমি জালিমদের দলভূক্ত হবে।

৬. অকাজালিকা------উম্মাল ক্কুরা। [শুরা-৭] অর্থ: এভাবেই আমি তোমার প্রতি আরবি ভাষায় কোরান অবতীর্ণ করেছি; যাতে তুমি মক্কা ও তার আশ-পার্শ্বের লোকদের সতর্ক করতে পার।

৭. ইন্না-আঞ্জালনা------খাছামাউ। [নিছা-১০৫] অর্থ:--- তোমার প্রতি-- কিতাব নাজিল করেছি; যাতে সে অনুসারে তুমি মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের [মোনাফেকদের] সমর্থনে তর্ক করিও না।

৮. ইত্তাবি মা ---বি অকিল। [আনআম-১০৬, ১০৭] অর্থ: -- তোমার প্রতি যা অহি হয় তুমি শুধু তারই অনুসরণ কর-----এবং তোমাকে তাদের উপরে দারোগা নিযুক্ত করিনি এবং তুমি তাদের অভিভাবকও নও।

৯. ফা-ছতাকীম---বাছিরুন। [হুদ-১১২] অর্থ: সুতরাং তুমি যেভাবে অহি প্রাপ্ত হয়েছো তার উপরেই অটল থাকো-- সাবধান! সীমা লঙ্ঘন করিও না--।

১০. ছুম্মা আওহাইনা ---মুশরেক্বীন। [নাহল-১২৩] অর্থ: এখন আমি তোমার প্রতি অহি করলাম 'তুমি একনিষ্ট ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ--।

১১. ইন্না-আনজাল না হু ফি লাইলাতুল ক্বাদরে----। [ক্বদর-১-৫] অর্থ: অবশ্যই আমি উহা তমশাচ্ছন্ন অন্ধকার যুগে দয়া পরবশ হয়ে তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি---।

১২. ইয়া আইয়ুহান্নাবী ওঁ! ইন্না আহ্লাল নাকা--। [আহজাব-৫০] অর্থ: হে নবী! নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে---তোমার মামা-খালার কন্যাগণ, চাচা-ফুফির কন্যাগণ---একমাত্র তোমার জন্য হালাল করেছি। সাধারণ মোসলেমদের জন্য হালাল করিনি--।

সবচেয়ে লোমহর্ষক আয়াত নামাজে আবৃতি করা হয়:

১৩. অক্বালু লান্নু'মিনা--আর্দ্বি ইয়ানবু'আ। আউ-তাকুনা---তাফজ্বীরা। আউ তুছক্বি ত্বাচ্ছামা-আ-ক্বাবিলা। আউ ইয়াবুনা লাকা--ইল্লা বাসারার রাসূলা। [বনি-ইস্রাইল- ৯০-৯৩] অর্থ: বলে, "কখনই আমরা তোমাতে ঈমান আনব না : যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে; যতক্ষণ না তোমার জন্য একটি আঙ্গুর বা খেজুরের বেহেস্ত [বাগান] দেখতে পাবো, যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় নদী-নালা প্রবাহিত করবে; যতক্ষণ না তুমি আকাশকে খন্ড-বিখন্ড করে আমাদের উপর ফেলবে, এবং যতক্ষণ না তুমি আল্লাহ ও ফিরিস্তাদের আমাদের সম্মুখে হাজির করবে। যতক্ষণ না দেখবো যে তোমার একখানা স্বর্ণ নির্মিত বাড়ি আছে, এবং যতক্ষণ না তুমি আকাশে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেতে পার; কিন্তু আকাশে অদৃশ্য হলেও তোমার উপরে আমরা ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না তুমি সেখান থেকে আমাদের জন্য একখানি আসমানী কেতাব বয়ে আনবে, যা আমরা পাঠ করতে পারবো।" তুমি জবাব দাও! 'পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো কেবল একজন মানুষ ও রাসূল মাত্র।'

১৪. অ- লাও ত্বাকাব্বালা আলাইনা------ আনহু হা-জ্বিযীন। [হাক্বক্বা-৪৪-৪৭] অর্থ: সে [নবী] যদি আমার নাম নিয়ে কিছু রচনা করতো, তবে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম, এবং তার জীবন ধমনী কেটে ফেলতাম; অতঃপর তোমাদের কেহই তাকে রক্ষা করতে পারতে না।

এধরণের অসংখ্য আয়াত কোরানের পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে। এবং তা নামজে ঘোষনা বা আবৃতি করেই রুকু সেজদাও করি অতঃপর নামাজের সমাপ্তি ঘোষণা করি!! অর্থাৎ বিশ্বের সকল মোসলেমগণ মসজিদে অথবা ঘরে বাইরে আল্লাহর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নবীকে [সা] আদেশ উপদেশ দিয়ে নামাজ পড়ে মোসলেম, মোমেন, আলেম, আল্লামা, পীর, কামেল,জামানার মোজাদ্দেদ হিসাবে আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকেন! নামাজে যা বলা হবে তা না জেনে, না বুঝে, ছালাতে যাওয়া নিষিদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ আশা করি কিছুটা হলেও পরিস্কার।

'ছালাত' আরবি শব্দ, 'নামাজ' পারশী শব্দ, দুটোই আমাদের কাছে বিদেশী ভাষা এবং সমভাবে অজ্ঞাত; এজন্যই এবং স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, নামাজ কিভাবে পড়বো! কি কি পড়বো, হাত কতখানি উঠাবো, রুকু সেজদা কেমন করে করবো ইত্যাদি। কিন্তু যদি নামাজকে 'প্রার্থনা' বলতে শিখতাম তবে শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু মুহূর্তের মধ্যেই বোধগম্য হতো। প্রার্থনায় কি কি বলা উচিৎ বা অনুচিৎ; কোন আয়াত বলা সঙ্গত বা অসঙ্গত;আপন আপন ভাষায় বলা যাবে কিনা! তা 'প্রার্থনা' শব্দটিই বুঝিয়ে দিত। 'ভিক্ষা' কিভাবে করতে হয় তা ভিক্ষুককে শিখিয়ে দিতে হয় না বরং পেটের চাহিদা অনুযায়ী 'ভিক্ষা' শব্দটিই তাকে বুঝিয়ে দেয়।

আর একটি বিষয় আলোকপাত করা একান্ত জরুরী মনে করি, আর তা হলো: নামাজে আমরা আল্লাহকে হাজির নাজির কান্ডজ্ঞান করে গুণগান, আত্মসমর্পণ ও আবেদন-নিবেদন করে থাকি। অতঃপর ডানে বাঁয়ে ছালাম ফিরিয়ে আল্লাহর দরবার

থেকে বিদায় হই। অর্থাৎ আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বাভাবিক হই; অর্থাৎ এখন আর নামাজে রত নই, নামাজ শেষ। অতঃপর দু'হাত তুলে আপন সন্তান থেকে শুরু করে চৌদ্দ পুরুষ পর্যন্ত তাদের দোযখ মাফ তথা বেহেস্তে নেয়ার সুপারিশ শাফায়াতগুলি কার বা কোন্ আল্লাহর কাছে করে থাকি! আর মহানবী [সা] এমন কি অন্যায়, পাপ করেছিলেন যে কারণে অমুকের মত আলেম আর আমার মত জালেম, টাউট, বাটপার, ঘুষখোর, ধর্মব্যবসায়ী ও নিমক হারামীদের মহানবীর [সা] জন্য শান্তি ও বেহেস্ত নছিবের সুপারিশ করতে হয়! আজ সাড়ে চৌদ্দশত বৎসর যাবৎ শরিয়ত আল্লাহকে অনুরোধ করে আসছে যেন মুহম্মদকে মোকামে মাহমুদায় পৌঁছানো হয়। কিন্তু এখনও তাকে পৌঁছায়নি বলে আল্লাহকে অভিযুক্ত করে বলা হয়, 'তুমিতো ওয়াদা ভঙ্গ কর না।' একজন নবীর জন্য এটি নিতান্ত ঠাট্টা বিদ্রূপ, উপহাস ছাড়া আর কি বা হতে পারে!

ছালাত শব্দটি সমগ্র কোরানের শ্রেষ্ঠতম তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যাপক শব্দ। এটি আল্লাহর জন্য, ফেরেস্তার জন্য মানুষের জন্য অতঃপর গাছপালা, পশুপক্ষি,পাহাড়-পর্বত, এমনকি সমস্ত সৃষ্টির জন্য বহুস্থানে এবং বহুবার ব্যবহার দেখা যায়; সুতরাং আপন ছালাতের বৈশিষ্ট্য ও পন্থা নির্ধারণ করতে হলে গাছপালার ছালাত বুঝতে হবে, পাহাড়-পর্বতের ছালাত হৃদয়ঙ্গম করতে হবে; পশু-পক্ষির ছালাত অনুধাবন করতে হবে; অতএব শব্দটির পুনঃ গবেষণা অপরিহার্য।

মুনাজাত শব্দটিও পারশী। এর অর্থও নামাজ বা প্রার্থনা,পুজা বা ছালাত। সুরা ফাতেহার পরে একান্তই যদি কিছু আবেদন-নিবেদন করতে হয়, তবে তা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির চাওয়া পাওয়ার জন্য অসংখ্য সুন্দর সুন্দর সাজানো আয়াত রয়েছে অথবা হৃদয়ের স্বতন্ত্র বক্তব্যগুলি আপন ভাষায় আবেদন-নিবেদন করতে পারে এবং তাই-ই জরুরী। তাছাড়া কোন্ নবী কোন্ বিপদে কখন কিভাবে কি কথা বলে নামাজ করেছিলেন, মোমেন লোকেরা নামাজে কি বলেন তা কোরানে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। ইহা বুঝে পড়লে ক্রিয়া হবে, একনিষ্ঠতা আসবে, না বুঝলে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নেই। অথচ সেগুলি উপেক্ষা করে এমন কতকগুলি অবান্তর আয়াত ব্যবহার করা হয় যাতে সরাসরি আল্লাহর সাথে নামাজেই শরিক করে ফেলি নিজেরই অজান্তে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে! কোরান ঘোষণা করে :

ক্বাদ--- ফায়েলুন। [মুমিনুন-১-৩] অর্থ: ভক্তগণই সফলকামী যারা নামাজে চূড়ান্ত ভাবে একনিষ্ঠ এবং যারা অসার-অবান্তর কথা ও কর্ম করে না।

কোরানের আর একটি নির্দেশ দেখুন:

অলা-তাজ্বহার বিছালা-তিকা অলা-তুখা-ফিত বিহা-অবত্বাগি বাইনা জা-লিকা ছাবিলা। [বনি-ইস্রাইল-১১০] অর্থ: প্রার্থনার স্বর উঁচু কিংবা অতিশয় ক্ষীণ করিও না। বরং এ দুয়ের মধ্যম পথ অবলম্বন করিও।

শরিয়ত স্ব-জ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই যে মহা নবীর [সা] বে-ইজ্জত তথা ইসলামের মূল উৎপাটনের যে সুদুরপ্রসারী নীল নক্সা ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলছেন তা এখানেই দিনের আলোর মতই সু-স্পষ্ট। কিন্তু অন্ধ আলেমগণ উপলব্দি করত পারছেন না; আয়াতে সাধারণ ৩টি নির্দেশ:

তেলাওয়াত: (১) উচু স্বরে নয় (২) মনে মনেও নয় (৩) বরং মধ্যম স্বর। আদেশ ৩টি বোঝার জন্য ধ্যান-সাধনার দরকার আছে বলে মনে হয় না। পক্ষান্তরে, মহানবী কোরান বিরুদ্ধ কোন কাজ করেছেন বলেও কেউ স্বীকার করবেন না। অথচ ঠিক যে তিনটি বিষয় নিষেধ করা হয়েছে; অবিকল এবং ঠিক ঠিক সেই ৩টি বিষয়ই সরাসরি অস্বীকার করে মহানবীর নামে বিপরীত ছুন্নাত চালু করেছেন। উল্লেখিত অহিটি নবীর [সা] মুখে এইমাত্র ঘোষিত হওয়ার পরক্ষণেই তিনি তা অস্বীকার করে নামাজের কিছু অংশ ও কিছু ওয়াক্ত উচ্চ স্বরে আবার কিছু অংশ একেবারে মনে মনে তেলাওয়াত করতেন? মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন না?? পক্ষান্তরে কোরান সাক্ষী দিচ্ছে যে, রাসুল নিজের তরফ থেকে কোন কিছু রচনা করলে আল্লাহ তার ঘাঁড়ের শিরা কেটে ফেলতেন! [দ্রঃ ১৪ নং] বিবি তালাক অথবা দোযখের ভয়ে আদিকাল থেকে মহিলাগণ কোরানের নির্দেশ অস্বীকার করে চূড়ান্ত নীরবে নামাজ করেন!

অবাক হওয়ার কথা, কোটি কোটি মোজাদ্দেদ আলেমদের একজনের কাছেও কি বিষয়টি ধরা পড়ে না? 'রাসুল কি জোহর ও আছরের নামাজে কিছু পড়তেন'? [দ্রঃ বোখারী] হাদিসে উল্লেখিত প্রশ্নটি অহেতুক ও অবান্তর মাত্র। নামাজে অবশ্য অবশ্যই যে কিছু তেলাওয়াত করা হয় তা মহানবীর ওফাতের প্রায় ৩০০ বৎসর পরে আবার নুতন করে রাসুলের দাঁড়ি মোবারক নড়াচড়া দেখে বা শুনে বিশ্বাস আনার যুক্তি কোথায়! তৎকালীন ছাহাবাগণ আবু হোরায়রাদের অতিরিক্ত হাদিস বয়ানে কেন রাগান্বিত হতেন! তা এখানেই সুস্পষ্ট। ভয় পাচ্ছি! নিু বর্ণিত আয়াতটি আমার জন্যই নির্দিষ্ট কিনা:

১. খাতামাল্লাহু আলা ক্বলুবিহীম অআলা ছাময়েহীম অআলা আবছারেহীম গেশাওয়া-তুন; অলাহুম আজাবুন আজীম [বাকারা-৭] অর্থ: আল্লাহ তাদের কান, অন্তর ও চোখ মুড়িয়ে অতঃপর সিল্ করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।
২. ইন্নাল্লাজীনা ইয়াকফুরূনা বিল্লা-হি--------অজাবাম্মুবিন। [নিছা-১৫০,১৫১] অর্থ: যারা আল্লাহ ও তার রাসুলদের অস্বীকার করে, এবং আল্লাহ ও রাসুলদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে অথবা বলে যে, কাউকে মানি, কাউকে মানি না অথবা এ দুয়ের মধ্যে অন্য কোন শরিয়ত তৈরি করে। মূলত ইহারাই কাফির। কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

আয়াতটি সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। নামাজে কোটি কোটি মোসলেম দিবারাত্র তেলাওয়াত করে থাকি। পক্ষান্তরে এই প্রকাশ্য নির্দেশ অস্বীকার করে আল্লাহর বিধান ফরজ তথা রাসুলের বিধান ছুন্নত, আল্লাহর গ্রন্থ কোরান তথা রাসুলের গ্রন্থ হাদিস; আল্লাহর নামাজ ফরজ তথা রাসুলের নামাজ ছুন্নত ইত্যাদি পাশাপাশি দুটি বিধানের প্রচলন করে আল্লাহ-রাসুলের মধ্যে ঘোর পার্থক্য সৃষ্টি করে আল্লাহর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মহা নবীকে চ্যালেঞ্জের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। শুধু তাই নয় খুঁটি-নাটি, বৃহত্তর সকল বিষয় আল্লাহর ছুন্নতের পাশাপাশি রাসুলের ছুন্নত নামে হাদিস রচনা করে শরিয়ত কোরানকে গিলে ফেলেছেন। কোরান আল্লাহর বিধান পক্ষান্তরে হাদিস রাসুলের বিধান! কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬,২৩৬টি পক্ষান্তরে হাদিসের আয়াত সংখ্যা ৭,০০০ হাজার থেকে ৪০ লক্ষ পর্যন্ত; একখানি কোরানের বিরুদ্ধে ৬ থেকে প্রায় ২০ খানি হাদিস রচিত হয়েছে। পক্ষান্তরে কোরান ঘোষণা করে:

১. অল্লাজীনা আমানু-------গাফু-রাররাহিম। [নিছা-১৫১-১৫২] অর্থ: যারা আল্লাহ ও তার রাসুলদের ভক্ত হয় এবং তাদের মধ্যে কোনরকম পার্থক্য করে না তাহাদিগকেই তিনি পুরস্কৃত করবেন। যারা পার্থক্য করে তারাই কাফের। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।
২. তিলকা আয়াতিল্লাহী নাতলুহা আলাইকা বেল হাক্বে; ফাবে আইয়ে হাদিসিন বাদাল্লাহি অ আয়াতিহী ইউমেনুন। [জাসিয়া-৬] অর্থ: এগুলি আল্লাহর সনাতন বানী; অতএব আল্লাহর হাদিস ছাড়া তারা আর কার হাদিসে বিশ্বাস করতে চায়?

আল্লাহর নামাজের নিয়ত, "--ফরজুল্লাহি তা'আলা--", পক্ষান্তরে রাসুলের নামাজের নিয়ত, "ছুন্নাতে রাসুল লীল্লাহী তা'আলা-- "। বলাবাহুল্য রাসুল [সা] কথিত ছুন্নত নামাজে নিজেও কি একই নিয়ত করতেন! তিনিও কি বলতেন, "ছুন্নাতে রাসুল লীল্লাহী তা'আলা"! যদি বলি 'হ্যাঁ!' তবে তিনি কোন্ রাসুলের ছুন্নাত পালন করতেন! যদি বলি 'না!' তবে তিনি যা বলেন নি তা ইমামগণ রচনা করলো কেন! আর কি নিয়তই বা তিনি করতেন! এই নামাজ কেন নীরবে করা হয়! কেন জামাতবদ্ধ হয়ে করা অবৈধ, তার কোন সদুত্তরও প্রচলিত হাদিস, ফেকহা, এজমা, কেয়াছ এমনকি আলেমদের সম্মিলিত ফতোয়ায়ও খুঁজে পাওয়া যায় না। "রাসুল করতেন তাই করি" এটা কোন সদুত্তর নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়। কারণ তিনি সত্যই করেছেন, বলেছেন কি না তার নিক্ষুত সাক্ষী প্রমাণ দিবে একমাত্র কোরান; দলীয় নির্দলীয় কোন ইমাম আলেম নয়।

নামাজ, ছালাত বা প্রার্থনা সকল জাতির প্রধান ও শ্রেষ্ঠতম ধর্মকর্ম। এখান থেকে জাতিকে পদস্খলন করতে পারলেই সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তাই অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মভাবে নামাজের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু এবং তার প্রকার ভেদ তথা পার্থক্য সৃষ্টি করে সমগ্র মুসলিম জাতিকে কথিত ইমামগণ কুফুরীর অতল সাগরে নিমজ্জিত করতে সক্ষম হয়েছে। এ কাজে মহানবীর মহাপবিত্র নামটিই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ তারা জানতেন যে, মহানবীর নাম শুনলেই এমনকি সাধারণ মোসলেমগণ হিতাহিত বিচার, জ্ঞান, বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেন। তার নামের উপরে আজও অশ্রু বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করে না। এই দুর্বলতার সুযোগেই মহানবীর নামে লক্ষ লক্ষ হাদিস রচনা করে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

দলীয় এবং কথিত ইমামদের এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল ভাবলে অবাক হতে হয়। নামাজের ঘোর সমর্থক সেজে নামাজের মধ্যেই যাবতীয় কুফুরী ঢুকিয়েছেন; আল্লাহ ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। ইবলিস তার ওয়াদা রক্ষা করে চলছে; ফলে আমরা যতই নামাজ করি ততই মনের অলক্ষ্যে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় উত্তরোত্তর কুফুরী বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। উল্লেখিত আয়াত সকল ইহার জলন্ত প্রমাণ। এর পিছনে মাত্র ৩টি হাদিস সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে: ক) কোরান পড়লেই, শুনলেই, মুখস্থ করলেই ছোয়াব। খ) আরবি অক্ষর প্রতি দশগুণ ছোয়াব। গ) নামাজে সুরা ফাতেহার পরে অন্যুন যেকোন ৩টি আয়াত পড়তেই হবে এবং অর্থ জানার দরকার নেই। পক্ষান্তরে কোরানে কম করে হলেও ১০০টিরও বেশি আয়াত আছে কোরান না বুঝে পড়ার বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয় অর্থ না জেনে, না বুঝে পড়া বা মুখস্থ করাকে কাফের, বধির, অন্ধ ও পুস্তক বহণকারী গাঁধার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। [দ্র: বাকারা: ১৭১; আরাফ: ১৭৯; আনফাল : ২২; জুমুয়া: ৫ ।] তারপরেও কোরান দ্ব্যর্থহীণ ভাষায় ঘোষণা করে:

অ ইয়াজআলু------ইয়াকেলুন। [ইউনুস-১০০] অর্থ: এবং যারা বুঝতে চেষ্টা করে না আল্লাহ তাদের দিকে আবর্জনা/ বিষ্ঠা নিক্ষেপ [কলুষিত] করেন।

প্রধানত শরিয়ত কেন উগ্র, খুণী, ধৈর্যহীণ, বর্বর, কর্মবিমূখ ও অভাবী অর্থাৎ রহমত বিবর্জিত ও অভিশপ্ত! উল্লেখিত আয়াতটিই তা বলে দেয়। এসমস্ত আয়াতগুলির অর্থ জানা থাকলে ইসলামের ঘোর শত্রু ইমাম আবু হানিফা ও বোখারীদের উপর ইমান এনে কথিত আলেম আল্লামা তথা মোসলেম জাতি পথ ভ্রষ্ট হতো না। এক্ষণে উচিৎ নামাজের বিষয় বস্তু ও বক্তব্যগুলি কোরানের আলোকে পুন:বিন্যস্ত করে মোসলমান জাতিকে সমূহ শেরেকী থেকে রক্ষা করা। কিন্তু আমাদের আল্লাহগণ [মাওলানা,সাইদি অর্থ: আমরা বা আমাদের প্রভু] রাজি হবেন কি!

আল্লাহবোধ ও সাধনার সূত্র সূচনা এবং কিবলা স্ব-স্ব জীবের অন্তর। এখানে হিন্দু মোসলেম ইত্যাদি জাতের পার্থক্য নেই এবং মসজিদ-মন্দির-গির্জা ইত্যাদি স্থানেরও গুরুত্ব নেই। হিন্দুর হৃদয়ে আল্লাহ আছে কিন্তু কথিত আল্লাহর ঘর মসজিদে

থেকে বিতাড়িত হয়, মোসলমানের হৃদয়ে আল্লাহ আছে কিন্তু মন্দির থেকে ধিকৃত হয়; অতএব তারা প্রকারান্তরে আল্লাহকেই কি বিতাড়িত করে না! যারা করে তারা অবশ্যই কি মোশরেক নয়! ইট-পাথরের মসজিদ, মন্দির 'আল্লাহর ঘর' বলতে পরার্থে অর্থাৎ সকলের সম-অধিকার; আর মূলত আল্লাহর ঘর বলতে স্ব স্ব মন-মন্দির বুঝায়; এই মন-মন্দির পবিত্র রাখলে এমনকি সাম্প্রদায়িকতার কুফুরী চিন্তা হৃদয়ে ঢুকতে পারে না। আর আদিকাল থেকে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ খুণও হয় না।

ছালাতের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গভীর ধ্যান সাধনায় আত্ম দর্শণ করা,নিজকে আবিষ্কার করা। এজন্য দরকার নিরব স্থান, শান্ত-প্রশান্ত হৃদয়। রাসূলের মসজিদ ছিল হেরা গুহা ও আপন ঘর। বাইরের মসজিদ ছিল শিক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র মাত্র। ছালাত মানেই কনছেনট্রেসন, মেডিটেসন; কিছু আয়ত্ব করার চূড়ান্ত একাগ্রতা; কোরান দেখুন:

১. অমা---কাইয়েমাত। [দ্রঃ বাইয়েনা-৫] অর্থঃ তারা আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্তে চূড়ান্ত এবং একনিষ্ঠভাবে নামাজ-সাধনার মাধ্যমে পবিত্র [জাকাতী] হতে।
২. ক্বাদ---খাসেউন। [দ্রঃ মুমিনুন-১-২] অর্থঃ ঐ সকল ভক্তগণই কৃতকার্য যারা কঠিন ধ্যান-সাধনায়/গবেষণায় [সালাত] আত্ম নিয়োগ করে।
৩. ইন্নি---মোসরেক্বীন। [আনআম-৭৯] অর্থঃ আমি একনিষ্ঠভাবে গভীর সাধনায় রত হলাম--।

ছালাতের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ কি তা শরিয়তিদের স্বীকৃত হাদিসেই বর্ণিত আছে যে, যুদ্ধাহত হযরত আলীর পায়ে বিদ্ধ তীর প্রচন্ড ব্যাথায় কিছুতেই খুলতে পারছিলেন না, অতঃপর তিনি বললেন, 'আমি যখন সালাতে রত থাকি ঠিক তখনই তীর বাহির করিও।' [দ্রঃ বোখারী হাদিস]